মুখোশের মুখ — সনাতনী ধর্মের কুৎসিত স্থুল শরীর

অমর ভট্টাচার্য্য

১৯০২ সালে বিজ্ঞানী প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তার ‘হিন্দু রসায়ণ-বিজ্ঞানের ইতিহাস’ গ্রন্থে প্র তুলেছিলেন, ভারতে প্রকৃতি বিজ্ঞ ান অনেক প্রতিশ্রুতি নিয়ে শু হলেও কালক্রমে তার অবক্ষয়ের কারণ কি? এর উত্তর দিতে গিয়ে তিনি দু’টি কারণের কথা বললেন। সামাজিক ও মতাদর্শগত। সামাজিক কারণ বোঝাতে গিয়ে আসছে সনাতনী ধর্মের বর্ণশ্রম প্রথা যেখানে হাতের কাজ করে মানুষজনের মর্যাদা পৌঁছায় শূন্যের কোঠায়। কারিগর পরিণত হয় নীচু জাতের মানুষে। প্রাচীন ভারতের এই জ াতপাতের ব্যবস্থা শ্রম ও মূলধনের সচলতা নষ্ট করে। উঁচু জাতের শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান তণরা জাতপাত প্রথার জন্য শিল্প প্রযুক্তিতে অংশ নিতে উৎসাহ হারায়। যার ফলে সবচাইতে চিন্তাশীল গোষ্ঠী সর্বোচ্চ দক্ষতা থেকে বিমুক্ত থাকে। প্রযুক্তি উদ্ভাবনের রাস্তা থেকে ভারত চিরকালের জন্যই দূরে সরে। তখনকার সংস্কারবাদীদের কেউ কেউ পুরানো রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের প্রভাব কাটিয়ে উঠে পশ্চিমের নতুন জীবনদর্শন গ্রহণের আহ্বান জানালোও গোঁড়া ভারতীয় নেতারা বললেন, ঐসব গুণাবলী সুদূর প্রাচীনকালে হিন্দুদের মধ্যেও দেখা যেত, পরে তা নাকি সমাজ ও ধর্মের অবক্ষয়ের জন্য লোপ পায়। অর্থাৎ ওদের মতে পশ্চিমের দ্বারস্থ হওয়ার দরকার নেই কোনো। এঁরা (বিবাকানন্দসহ) বৈদিক বলে ‘মূল’ চতুবর্ণের ব্যস্থ াকে সমর্থন করেছেন, প্রশংসা করেছেন, এই ব্যবস্থাকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন আবার মুখে আধুনিক যুগের জাতপাত ও অস্পৃশ্যতাকে নিন্দা করেছেন।

জাতিভেদ-প্রথাভিত্তিক সনাতনী ধর্মের মুখোশের আড়ালে থাকা কুৎসিত মুখচ্ছবি নিয়েই লিখতে অনুরোধ করা হয়েছিল সত্তরের দশকে জেলখাটা নকশাল কর্মী ও প্রবন্ধকার অমর ভট্টাচার্যকে। মতামতের দায়িত্ব সম্পূর্ণ ওঁরই।

— সম্পাদক

অযোধ্যার ‘বাবরি মসজিদ রামমন্দির’ বিতর্ককে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী এক মারাত্মক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যে এই প্রথম হল — তা নয়; ১৯৪৭ - এর পরবর্তী পর্যায়ে এদেশে হিন্দু মুসলমান বা বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবল ধর্মীয় অ াবেগকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক ভিত্তিতে বা সমস্ত ভারতব্যাপী বেশ কয়েকটি দাঙ্গা হয়েছে।

শুধু ভারতবর্ষই নয়, সমগ্র বিশ্বই এই কলঙ্কের হাত থেকে মুক্ত নয়। ১০৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সেলজ্জা তুর্কীদের হাত থেকে জেজ ালেমের অধিকারের জন্য পোপ দ্বিতীয় আর্বান এভাবেই এক ক্রশেড বা ধর্মযুদ্ধের ডাক দিয়েছেন। ৬৫৬ খৃষ্টাব্দের পর ধর্মও ভাগ হয়েছিল শিয়া- সুন্নি মতবাদে, সাম্প্রতিক কালের ইরাক-ইরান যুদ্ধেও যার উপাদান মেলে। ইতিহাস প্রমাণ দেয়, সমস্ত ধর্মের নামে যুদ্ধ আসলে মানুষের ধর্মীয় আবেগ সৃষ্টি করে ধর্মীয় নেতাদের ক্ষমতা সংহত করার চেষ্টামাত্র। মধ্যযুগের ক্রসেডের পরোক্ষ কারণ বিশ্লেষণ করলেই একথা বোঝা যায়। ঐতিহাসিকদের মতামত বিচার করলেই দেখা য ায়, সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপের মানুষ বহু শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। সামন্ত জমিদারদের অনেকেই পূর্বের প্রতিপত্তি কিছুটা হা রিয়ে, তাদের বর্তমান অবস্থায় ছিল অসন্তুষ্ট। ফলে তাদের অনেকেই এই ধর্মযুদ্ধকে তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের একটা বির াট সুযোগ বলে মনে করেছিল। দরিদ্র শ্রেণীর অনেকেই এই ধর্মযুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে সমাজে মর্যাদা পাব ার এবং আর্থিক সুবিধা পাবার কথা ভাবত। ইতিহাসে দেখা যায়, ১০৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম ক্রসেডে অংশ নেওয়া এরকম প্র ায় বিশ হাজার ক্ষুধিত মানুষ কেবল এই জাগতিক ক্ষুধা-তৃষ্ণা আর সমস্ত প্রভুদের অত্যাচার থেকে মুক্তি ও স্বাধীনতার

জন্য ত্রসেডে অংশ নিয়েছেন। কিন্তু তারা সুখ ও শান্তি চেয়ে পেয়েছিল মৃত্যু।

ধর্ম হচ্ছে প্রতিটি সমাজে হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা একটি চিন্তা ও তার অভিব্যাক্তি। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেকুরইজমের নাম করে, আমাদের মত দেশে যা বলা বা করা হয়, তা সবই হচ্ছে দেখানো ভাঁওতা। আর এ দেশের তথাকথিত বামপন্থিরাও পুঁজির সবধরনের প্রভুত্বের বিদ্ধে সংগ্রাম ব্যাতিরেকে, কেবল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নাটক শু করে, ভারতের শাসকশ্রেণীর তৈরী তথাকথিত সে 'সেকুলারইজমের' ছেঁড়া জুতো পায়ে গলিয়েই রাজনৈতিক মঞ্চে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

ধর্মের সমস্ত ধরনের হুমকির বিদ্ধে যিনি ২০ মিলিয়ন মানুষের এক বিশাল দেশকে বেঁধেছেন শ্রমিক সম্প্রীতির ডোরে, সেই লেলিন বলেছেন — ''মেহনতী জনগণের সামাজিক দলিতাবস্থা, পুঁজিবাদের অন্ধশক্তির সামনে তাদের বাহ্যত পূর্ণ অসহায়তা, যুদ্ধ, ভূমিকম্প ইত্যাদি সবকিছু অসাধারণ ঘটনার চেয়েও এই পুঁজিবাদের সাধারণ মেহনতী মানুষের উপর প্রতিদিন, প্রতি ঘন্টার হাজার গুণ বেশি ভয়ঙ্কর কষ্ট ও প্রচন্ডতম যন্ত্রণা চাপিয়ে দিচ্ছে। এই হল ধর্মের গভীরতম সাম্প্রতিক শিকড়। তাই পুঁজিবাদের অন্ধ ধবংসশক্তির অধীনস্থ জনগণ যতদিন নিজেরাই সম্মিলিত, সংগঠিত, সুপরিকল্পিত ও সচেতন ভাবে ধর্মের শিকড়ের বিদ্ধে, পুঁজির সবধরণের প্রভুত্বের বিদ্ধে লড়াই না করতে শিখছে, ততদিন কোনো জ্ঞান-প্রচারণী পুস্তিকাতেই জনগণের মধ্য থেকে ধর্মকে মোছা যাবে না।''

এ-থেকে কি এই সিদ্ধান্তে দাঁড়ায় যে, ধর্মের কোনো জ্ঞান-প্রচারনী পুস্তিকা ক্ষতিকর বা অবান্তর? নিশ্চয়ই তা নয়। বরং এর মানে হচ্ছে — ''সোশ্যাল ডেমোক্রেসির নিরীশ্বরবাদী প্রচারকে হতে হবে মূল কর্তব্য অর্থাৎ শোষকদের বিদ্ধে শোষিত জনগণের শ্রেণীসংগ্রাম বৃদ্ধিরই অধিনস্থ।'' তাই প্রলেতারিয় শ্রেণী সংগ্রাম অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, খুব সংক্ষেপে আমরা ''সনাতনী'' হিন্দুধর্মের উৎপত্তি ও বিবর্তন প্রসঙ্গে এই লেখায় আলোচনা করব।

আজ থেকে কোটি কোটি বছর আগের কথা মানুষ তখন ছিল সম্পূর্ণ প্রকৃতি - নির্ভর। বনের ফলমূল খেয়ে আর আর জীবজন্তুর শিকার করেই তারা জীবনধারণ করত, বড় বড় গাছের কোটরে আর গুহায় তারা বসবাস করত। প্রকৃতির বহু সম্পদ ও রহস্য তখন ছিল তাদের অজানা।

জীবন ধারণের সংগ্রামে প্রকৃতির কাছে বারবার ৱবিপর্যস্ত হতে লাগল তারা। দুরন্ত ঘুণি'ঝড়ের তান্ডবে আদিম মানব আর দৃশ্যমান পাশুপাখি হত মৃত ও গৃহহারা। গাছপালা ধবংশের ফলে খাদ্যের ভান্ডারে টান পড়তে লাগল তাদের। বজ্রপাতে জ্বলে যেতে লাগল তাদের গাছের কোটরের আশ্রয় স্থলগুলি; গাছে গাছে ঘর্ষনে সৃষ্ট দাবানলে নিশ্চিত মৃত্যুর বিভীষিকা দখত তারা। আতঙ্কে দিশাহারা মানবেরা প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে যখন ছুটে যেতে গভীর জঙ্গলের বাইরে ফাঁকা নদী বা সমুদ্রের কিনারায় — ভয়ানক জলোচ্ছ্বাসে সেখানেও মৃত্যু হত তাদের। সূর্য্যকিরণ তাদের নগ্নদেহগুলিকে বাঁচিয়ে রাখত। এইভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল আদিম অনুন্নত মানবগোষ্ঠীরগুলির মধ্যে অতিপ্রাকৃত ঈশ্বর ঘারণার জন্ম হল। প্রকৃতির কাছে আদিম মানুষের এই ভয়মিশ্রিত আত্মসমর্পণের রূপ দেখি আমরা অগ্নি, বায়ু, বণ, পৃথিবী, সূর্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির উপরে দেবত্ব আরোপের মাধ্যমে। দেবতা বা ধর্ম যেমন হাজার বছরের পুরাতন এক সংস্কৃতি, তেমনি একথাও সত্য যে প্রতিটি বস্তু ও ঘটনার মত এরও একটা শু ও বিকাশের ইতিহাস আছে। তাই যে হিন্দুধর্মকে 'সনাতন', 'সুপ্রাচীন', 'মহান' প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে, তাকে চোখ দিয়ে দেখে ও জিজ্ঞাসুর মন নিয়ে তাকে একটু বিশ্লেষণ করে দেখতে চাই।

বৈদিক আর্যরাই প্রথম ভারতে সভ্যতার আলো জ্বালিয়ে ছিলেন এবং ভারতের সভ্যজাতি ও গোষ্ঠীগুলি সবাই আর্যসন্তানস এ-ধারণা ভুল। কারণ মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান প্রমাণ করেছে যে, বৈদিক আর্যদের ভারতে আসার অনেক আগেই এবং যীশু খ্রীস্টের জন্মের হাজার তিনেক বছর আগেই ভারতবর্ষ সভ্যদেশ ছিল — যে সভ্যতা বয়সে মিশর ও সুমেরীয় সভ্যতার সমসাময়িক এবং ঠিক এই দুই সভ্যতার মতই উন্নত। এদরে হাজার দুই বছর পরে বৈদিক আর্যরা ভারতবর্ষে এসে বসতি স্থাপনে করে। আর্যরা ছিলেন যাযাবর জাতি। তারা লোহার ব্যবহার জানতেন এবং আরণ্যক ঘোড়াকে পোষ মানাতে শিখেছিলেন। এই দুই-এর সাহায্যে তারা উত্তরাপথ দখল করে নেন। তখন সেখানকার অধিবাসীদের এক অংশ পালিয়ে যান পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে আর অপর অংশ উত্তরেই থেকে যান বিজয়ী আর্যদের দাসরূপে। পরবর্তী এঁরাই পরিচিত হন শূদ্র জাতি হিসাবে। বিজযী আর্যরা একদিকে যেমন অনার্যদের সভ্যতা, সংস্কৃতি প্রভৃতি

ধবংস করে দিতে চেয়েছেন — অন্যদিকে তেমনি বাস্তব কারণেই আর্য-অনার্যদের মিলন গড়ে উঠেছিল। তাই দেখি অন
ার্যদের মিলন ব্রহ্মা ও শিব, আর্য সমাজের পুজিত দেবতা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। এইভাবেই একসময় আর্য-অন
ার্যদের সংমিশ্রণ মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মের উৎপত্তি হয়েছে।

আদিম শ্রেণীপূর্ব সমাজের যুগপৎ প্রকৃতিকে ভয় পাবার এবং তাকে পরাজিত করবার কাল্পনিক ইচ্ছা শক্তির ইন্দ্রজালের সংমিশ্রণের ধারাকে ধরেই শ্রেণী সমাজেতে বণিক শ্রেণীর স্বার্থে সমাজের উৎপত্তি ও প্রসার হয়। হিন্দুধর্ম এর ব্যতিক্রম নয়। রাজা বা গোষ্ঠীপতির উপর দেবত্ব আরোপ এরই অঙ্গ। রাজনীতির উপরি কাঠামো হিসাবে শিল্প সংস্কৃতিও যুগে যুগে পরিবর্তিতহয়েছে। চিরকালই সংস্কৃতির দুই ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটা অন্ধ বিশ্বাসের অন্যটা স্বাধীন চিন্তার; প্রথমটা চায় মানতে, পরেরটা চায় জানতে।

হিন্দু সংস্কৃতির মূলধারা বেদ এবং পুরাণেও এই পদ্ধতির টানাপোড়েন দেখতে পাওয়া যায়। গীতায় আছে — "ওঁ ত'সদিতি নির্দোশো ব্রাহ্মণ ত্রিবিধ স্মৃতঃ। ব্রহ্মণাস্তেন বেদাশ্চযজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পরা।" (অর্থাৎ ওঁ তৎসৎ, এই ত্রিশব্দ পরম াত্মার নাম, ইহাই শাস্ত্রে কথিত আছে। ইহার দ্বারাই ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রথমে যজ্ঞকর্তা ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞের হেতু বেদ সৃষ্টি করেছিলেন।) তাই ঈশ্বরের এই সৃষ্টি এবং ঈশ্বর সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করা চলবে না।

তাই পার্থের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের চরম আজ্ঞা হল — "সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" (প্রশ্ন কোরো না, আমায় অনুসরণ কর)। কিন্তু বৈদিক যুগ থেকেই পৃথিবীর এই সৃষ্টি রহস্য অনেকে মানতে চাননি, মানতে চাননি ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা র পে। তাই গীতায় কৃষ্ণকে খেদ ভরে বলতে হয়েছে — 'অসত্যম প্রতিষ্ঠংতে জগদাশুরণীশ্বরম্। অপরস্পর সম্ভূতাং কিমন্যাং কাম হৈর্তুকাম্।।১ (তাহারা (অসুর) বলে যে এই জগৎ মিথ্যা; ইহাক কোনো ধর্ম বা অধর্ম নেই, কোনো ঈশ্বর নেই। স্ত্রী পুষের মিলনে ইহার সৃষ্টি হয়েছে।)

বেদের অসদ্ সূক্তে মানুষ প্রশ্ন করেছে ঃ এই সৃষ্টির আদি কি, অন্ত কি? "সো অঙ্গ বেদ, ইয়াদি ইয়্যান বেদ" বেদ সম্ভবত তা জানে কিংবা জানে না।

এই যে সংশয়বাদীতা তা ত্রমান্বয়ে সাংখ্য এবং লোকায়ত দর্শনের মাধ্যমে বিকশিত হলো ও শেষ পর্যন্ত সমস্ত সংস্কার এমনকি ঈশ্বরের অস্তিত্বকেই চ্যালেঞ্জ জানাল। কখনও কখনও অন্ধসংস্কার — বিশ্বাস প্রবল হয়েছে, কখনও চেষ্টা হয়েছে এই দুয়ের মাঝামাঝি মীমাংসার। এইভাবেই লোকায়ত দর্শন, কপিলের সাংখ্য দর্শন, চার্বাক দর্শন, কণ্যাদের বিজ্ঞান, আর্য ভট্টের জ্যোর্তিবিজ্ঞান, সুশ্রুতের শল্য চিকিৎসা মানব সভ্যতার প্রথম সারিতে ভারতবর্ষকে দাঁড় করিয়েছিল। াবার পরবর্তীতে পুরাণ, অদৃষ্টবাদ, তন্ত্রবাদ, মুক্তচিন্তার গলা টিপে ভারতীয় সমাজকে সমাজকে পিছু হটিয়ে দেয়।

মানুষের মানবলোকই প্রথম ঈশ্বরের জন্ম দেয়। পৃথিবীর সবদেশেই মানুষ তাদের ঈশ্বর দেবদেবীর মূর্তি কল্পনা করে। প্রাণী জগতের মধ্যে মানুষের মস্তিষ্ক, চিন্তা করার ক্ষমতা ও সূক্ষ্ম কাজ করার দক্ষতা সবচেয়ে বেশি। তাই তাদের কল্পনাকে ত ারা বাস্তবে রূপ দিতে পেরেছে। প্রত্যেক জাতির দেবতাদের চেহারা হয়েছে তাদের গোষ্ঠীর আদলে। এভাবেই ইথিওপিয় ান দেবতার নাক ভোঁতা, চুল কালো। থ্রাসিয়ান দেবতার চুল লাল ও চোখ বাদামী, এইভাবেই সাঁওতালদের দেবতাদের রঙ কালো।

হিন্দুদের কালী দূর্গা বা অন্যান্য মূর্ত্তিও কল্পনা করা হয়েছে নিজেদের মত করেই, ঠিক ঐ ইথিওপিয়ান বা থ্রাসিয়ান মত। ম ানব গোষ্ঠারগুলির আচার ব্যবহার তারতম্যের সাথে সাথে ই জন্যই 'সর্ববিশ্বব্যাপী' ঈশ্বরের পরিবর্তন ঘটেছে গঠনে ও পূজ ার আচারে; বাঙালী হিন্দুরা দূর্গাদেবীকে শাড়ী পরায়, অসমে আবার শাড়ী বদলে মেখলা পোশাকে সজ্জিত দেবী প্রতিমা তৈরী হয়।

দেবদেবীর এই কাল্পনীক মূর্তি রচনার বিভিন্ন স্তরভেদ ছিল। প্রথমে দেবদেবীর কল্পিত হয়েছে শক্তিমান জন্তু জানোয়ারের মূর্তিতে। এইভাবে গ্রীক দেবতা জাউস কল্পিত হয়েছে ঈগল রূপে; আর্টেমিসের মূর্তি ছিল হরিণের মত, অনুবিসের শৃগ ালের মত।

এরপর মানুষ দেবদেবীর মূর্তির উপর নিজের শারীরিক বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছে। মিশরের তো বিড়াল, কুকুর শিয়াল ইত্যাদি বহু জন্তু মূর্তিই দেবজ্ঞানের পূজিত হয়েছে। হিন্দুদের মধ্যেও হাতির মাথাওয়ালা গণেশ বা সরাসরি দেবীজ্ঞানের পূজিতা হয় গাভী। বিভিন্ন দেবদেবীর পূজার সাথে বিভিন্ন 'দেবীবাহন'-এর পূজা উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর নানা প্রান্তের নান

সংস্কৃতির মানুষই এইভাবেই ঈশ্বরের কল্পনা করেছে এবং এই কল্পনার উপরেই ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এক কৃত্রিম বিভাগ, ধর্মের নামে। প্রতিটি ধর্মের তথাকথিত ঈশ্বর যেমন কাল্পনিক ও মনুষ্য-সৃষ্টি, তেমনি ধর্মীয় নানা অনুশাসনের বিধিনিষেধ তৎকালীন যুগপোযোগী নৈতিকতা ও মনুষ্য-সৃষ্ট অজ্ঞতা এবং অসহায়তা থেকেই তৈরী হয়েছে। এইভাবেই ঈশ্বর বিশ্বাসের সৃষ্টি হলেও ঈশ্বর তথা ধর্মীয় বিশ্বাস পরবর্তীকালে নানাভাবে মানুষের স্বার্থ মিটিয়েছে। এবং প্রকৃতপক্ষে শ্রেণী বিভক্ত সমাজে ধর্ম সব সময়ই প্রতিক্রীয়াশীল ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

শোষিতরা হতাশ ব্যর্থ হয়ে আশ্রয় নিয়েছে ধর্মে আর শোষকরা ধর্মকে ব্যবহার করেছে শোষণের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে। সাংস্কৃতির বিভিন্ন পর্যয়ে ধর্মের এমনই বিভিন্ন রূপ। ইংলন্ডে ১৩৮১ সালের সামন্ত সমাজের বিদ্ধে বিদ্রোহে ইংরেজ কিষানদের তাই বলতে শোনা যায় — "খ্রীস্টের অনুকৃতিতেই ঈশ্বর আমাদের সবাইকে গড়েছেন, তবু আমাদের সঙ্গে এমন পশুর মত ব্যবহার করা হয় কেন?" আবার সামন্তপ্রভুও চার্চের সাহায্যে ধর্মীয় অনুশাসনেই এই বিদ্রোহ স্তব্ধ করা হয়। ামাদের ১৮৫৫সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩ — ১৮০০) ও তীতুমীরের আওয়াজেও তাই গরীব সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাস দেখা যায়।

দুঃখের বোঝায় জীবন যাদের ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে, তাদের প্রবোধ দেওয়া হয় পারলৌকিক জীবনের নিরবচ্ছিন্ন স্বর্গীয় সুখের ও জন্মান্তরের আশার বাণী শুনিয়ে।

বাস্তব জীবনের সুখ সাচ্ছন্দে বঞ্চিত-মানুষের সামনে তাই সমস্ত ধর্মের গুরাই প্রাচীন রীতিনীতির মহিমা ও ত্যাগের মাহাত্ম্য প্রচার করেন। মজার কথা হল, ভাবের রাজ্যে তারা সর্বজীবে ব্রহ্মের স্থিতি প্রচার করছে, অথচ মানুষকে জঘন্যভাবে অচ্ছুৎ করে রেখেছে। বেদ উপনিষদ শিক্ষার চর্চায় শূদ্রদের কোনো অধিকার ছিল না। তারা কেউ তপস্যা করলে শিরচ্ছেদ হবে — যেমন হয়েছে রামের হাতে শম্বুকের।

শূদ্রর কানে বেদ মন্ত্র ঢুকলে সে কানে গরম সীসে ঢেলে দেবার আদেশ অছে মনু-সিংহতায়। অথচ উচচ বর্ণের প্রয়োজনে শূদ্রদের নির্বিচারে কাজে লাগিয়েছে তারা। গুহক-চন্ডালের নৌকো করে রামচন্দ্র নদী পার হয়েছে। বেদব্যাস পিতা পরাশরের পৌষে বাধেনি ধীবর কন্যা মৎসগন্ধাকে দ্বীপ টেনে নিয়ে বলাৎকার করতে। নীতি হিসাবে অহিংসা, আস্তেয় ও বৈরাগ্যের প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু কার্যত হিংসা, দুর্নীতি ও ভোগ বিলাসের চর্চাই চলেছে। বেদ-ব্রহ্মণ-বিরোধী প্রচারকে উন্মত্তের মত ধবংস করা হয়েছে। এইভাবে চার্বাই দর্শনের সমস্ত পুঁথি বৈদিক ব্রাহ্মণেরা ধবংস করে দিয়েছিল।

কি ছিল চার্বাকপন্থীদের দর্শনে? সরাসরি এ-সম্পর্কে কোনো পুঁথিপত্র না পাওয়া গেলেও সনাতন পন্থীদের ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপের থেকে যেটুকু জানা যায় তা হল, তাঁদের মতে মাটি, জল, আগুন ও বায়ু — এই চার ভূতের সম্মিলিত রাসায়নিক ক্রিয়ায় এই জীবনের উৎপত্তি। প্রাণ বা চেতনাকে তারা সজীবতার অংশ বলে মনে করতেন। তাঁদের বিচারে তাই আত্মা বলে কিছু নেই। তাঁদের মতে জীবনান্তের সাথে সাথেই সব কিছুর অবসান; প্রাক্তন কর্মফল বলে কিছু নেই, সুতরাং পুরস্কার বা তিরস্কার ভোগ করার জন্য জন্মান্তরবাদে তাদের আস্থা নেই। অর্থাৎ চার্বাকপন্থীরা আত্মা ও আকাশের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন অদৃশ্য বলে। ভবিতব্য, জন্মান্তরবাদ, মোক্ষকে অস্বীকার করেছেন কল্পিত বলে। ঈশ্বরকে অস্বীকার করেছেন অপ্রামাণ্য বলে। পূজা-উপাসনা, ব্রত-উপবাস ও শ্রাদ্ধ-তর্পণ বর্জনীয় বলেছেন অনাবশ্যক বলে। অতএব মৈত্রায়নী উপনিষদে বলা আছে — "তৈঃসহন সাংবৎসেৎ" — এদের সঙ্গে বাস করা যাবে না। মনু নির্দেশ দিলেন এদের সাধু ও শিষ্যদের সমাজ থেকে বহিষ্কারের। কিছু পুরাণ এদের সাথে বাক্যালাপ নিষিদ্ধ করেছে — "ব্যাঙ্ মাত্রেনানি নার্চয়েৎ"। মহাভারতের শান্তিপর্বে আছে, দেবতারা ব্রহ্মার কাছে চার্বাকের মৃত্যুর কথা জানতে চাইলেন। সমস্ত ধর্মই দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করা বাহ্যিক শক্তিগুলির মানব মনে প্রতিফলিত ছাড়া আর কিছুই নয়। এই প্রতিফলনের প্রক্রিয়ায় জাগতিক শক্তিগুলি অতিপ্রাকৃত রূপ পায়। ইতিহাসের শুতে প্রকৃতির নানা শক্তিই কেবল এভাবে প্রতিফলিত হয় এবং ক্রম বিবর্তনের ফলে, বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর মধ্যে, বহু বিচিত্র ধরনের ব্যক্তিত্ব এতে আরোপিত হয়েছে।

কিন্তু খুব বেশি দিনের কথা নয়, প্রাকৃতিক শক্তিগুলির পাশাপাশি সামাজিক শক্তিগুলিও সক্রিয় হতে শু করল। এই শক্তিগুলি প্রাকৃতিক শক্তির মত একই ধরণের বৈরিতা, রহস্যময়তা, শক্তিমত্তা নিয়ে মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে থাকল, যেন স্বাভাবিক ভাবেই। যে সব অদ্ভূত চরিত্রগুলো এতদিন শুধু রহস্যময় শক্তিগুলিরই প্রতিনিধিত্ব করত, এখন থেকে তারা সামাজিক রূপ পেল, ইতিহাসের শক্তিগুলির প্রতিনিধিত্ব করতে লাগল।

এভাবেই অত্যাচারী চরিত্রহীন রাজারাও দেবজ্ঞানে পূজিত হতে লাগল। ধর্মীয় অনুশাসনে রাজদ্রোহিতা 'পাপ' ও 'নরক'-বাসের যোগ্য বলে অভিহিত হল। অন্যদিকে পরম সম্মানিত পূজা দেবদেবীর চরিত্রের মধ্যেও প্রক্ষিপ্ত হতে থাকল এই রাজার মানবিক চরিত্র ও চরিত্রহীনতা।

হিন্দু ধর্মের দেবতাদের রাজা ইন্দ্র — আর্য-অনার্যদের সংগ্রাম প্রধান সেনাপতি। নগরের পর নগর ধবংস করেছিল বলে তার নাম পুরন্দর। ইন্দ্র যে একজন সমর নায়ক, তা ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মন্ডলের ১২/৪ সুক্তে এবং তৃতীয় মন্ডলের ৩৪/৯ সুক্তেই বোঝা যায়। যাইহোক, এই ইন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত কামুক ও চরিত্রহীন। পান্ডুর স্ত্রীর সাথে অবৈধ সম্পর্কের ফলে জন্ম হয় অর্জুনের। গৌতমের স্ত্রী অহল্যা কিংবা দেবশর্মার স্ত্রী চির মত বহুজনই তার লালসার শিকার। সে মদ্যপও বটে। সে ামরস ছিল তার প্রিয় পানীয়। জন্মেই মাতা অদিতির স্তনে সে সোম দর্শন করে। পিতার তৃষ্ণার সোম সে জোর করে খেয়ে নেয়। নিজের লালসা সংযত করতে না পেরে ইন্দ্রানীর সতীত্ব নষ্ট করে ও নিজের শ্বশুর পুলোমাকে মেরে ফেলে। দেবরাজ ইন্দ্রের এই ধরনের অজস্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেন এক অত্যাচারী রাজারই প্রতিচ্ছবি — যে রাজাকে প্রজাদের কাছে গ্রহণীয় করার জন্য, এক কৌশলি প্রচেষ্টা এর মধ্যে স্পষ্ট।

শাসক শ্রেণীর স্বার্থে তৈরী করা হয়েছে ধর্মীয় অনুশাসনকে। এই জন্যই 'ধার্মিক' খ্রিস্টানদের বলা হয়েছে — "যদি তোমার ভাই, স্ত্রী, পুত্র বা কন্যা গোপনে অন্য দেবতার আরাধনা করতে বলে তবে তাকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা কর।" 'ধার্মিক' মুসলমানকে বলা হয়েছে — "এক হাতে তরবারি ও অন্যহাতে কোরাণ নিয়ে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা কর"।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, 'রাষ্ট্র বিপ্লব' দমনে বা প্রজার উপর অতিরিক্ত কর চাপাতে সরাসরি ধর্মকে ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজাকে। প্রয়োজনে রাতের অন্ধকারে শিবলিঙ্গ স্থাপন করে তাকে 'স্বয়ম্ভু' বলে প্রচার করার পরিকল্পনাও ছকে দেওয়া আছে।

এই সময় এই আরোপিত ধর্মান্ধতারই চূড়ান্ত-বিরোধ ক্যাথলিক প্রোটেস্ট্যান্ট বিরোধে। ঈশ্বরের মহিমাকে অক্ষুন্ন রাখতে, ঐ সময় ধর্মীয় কারণে অসংখ্য মানুষকে প্রকাশ্যে, চার্চ ও রাষ্ট্রের মদতে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। একই সঙ্গে অন্তঃধর্ম সংঘর্ষগুলিও ঘটেছে হিন্দুদের মধ্যে শৈব-বৈষ্ণব-শক্তি বিরোধে; মুসমমানদের মধ্যে শিয়া-সুন্নী লড়াইতে; বৌদ্ধদের মধ্যে হীনযান-মহাযান সংগ্রামে। আর ধর্মে ধর্মে সংঘর্ষের কথা তো যত কম বলা যায় ততই ভাল। আজও তার মাসুল দিচ্ছেন অযোধ্যা, সারাজোভা-বসনিয়া, প্যালেস্টাইন ও আরও অসংখ্য স্থানের নির্যাতিত মানবগোষ্ঠীগুলি।

একটু নজর দিলেই আমরা দেখতে পাবো বেদ, উপনিষদের ছত্রে ছত্রে আজ জাগতিক চাহিদা পূরাণের আকূল প্রার্থনা, ঋগ্বেদের দশ সহস্রাধিক মন্ত্রের মধ্যে আনুমানিক একদশমাংশে কেবল মাত্র 'আমাকে অর্থ দাও', 'গোধন দাও', 'অশ্ব দাও', এই সব মন্ত্র রয়েছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ ব্রাহ্মণে, এত অশ্লীল শ্লোকে আছে যা সাহিত্য বা নৈতিকতা সমস্ত কিছুকেই অত্যন্ত হীন করে তুলেছে। চিরন্ততার অচলায়তন যে কত ভ্রান্ত, তা সহজেই বোঝা যায়। যে গোমাংস ভক্ষণ আজ হিন্দুদের ধর্মান্তরিতকরনের সমান সেই গাভী, অশ্ব, মহিষের মাংস ভক্ষণের কথা ঋগ্বেদের ছত্রে ছত্রে বর্তমান।

ঋগ্বেদের প্রথম মন্ডলের ১৬২/১১ সুক্তে অশ্ব মাংস ভক্ষণের উল্লেখ আছে। ষষ্ঠ মন্ডলে ১৭/১১ ঋকে ইন্দ্রের জন্য শত মহিষ পাকের উল্লেখ আছে। এমনকি বর্তমানে যে কুক্কুট বা মুরগী দিন্দুদের কাছে আচ্ছুৎ, শ্রী শ্রী চন্ডীর বর্ণনাতে দেখা যায় দেবী সেই কুক্কুট পরিবৃতা — "ময়ূর কুক্কুট বৃতে মহাশক্তি ধরে হন যে।"

মানুষের কল্পলোকে জন্ম নেওয়া ঈশ্বর এক সময় তার সৃষ্টিকর্তা মানুষের কল্পলোককেই বিপর্যস্ত করে তুলেছে; সৃষ্টি করেছে অন্ধ-অনুগত, মেদন্ডহীন, যুক্তিবোধহীন অসংখ্য সরল বিশ্বাসী ভক্তের। নিজের ভবিতব্য নিজে নিয়ন্ত্রণ করার পরিবর্তে অসহায় ভাবে মানুষ আত্মসমর্পন করেছে আলৌকিক, অতি প্রাকৃতিক এক সর্বশক্তিমানের কাছে, যা একান্তই অস্তিত্বহীন।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com